নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ... ২
শিশুকে কি খাওয়াবেন ... ৪
কানপাকা রোগ ... ৬

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ২ সংখ্যা ৪ মাঘ ১৪০০

ডিপথেরিয়া

ডাঃ অমল মিত্র

ডিপথেরিয়া একটি মারাত্মক অথচ প্রতিরোধযোগ্য রোগ। শিশুরাই সাধারণতঃ এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয় এবং রোগটি অতি দ্রুত আক্রান্ত ব্যক্তির সর্বনাশ ডেকে আনে। এই রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। ডিপথেরিয়ার প্রাথমিক উপসর্গ হলো গলা ব্যথা। তাই যে কোন রোগী বিশেষ করে শিশুরা গলা ব্যথার কথা বললে অবশ্যই একবার ডিপথেরিয়ার কথা ভাবতে হবে। আর ডাক্তার রোগ সন্দেহ করলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ল্যাবরেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হতে হবে।

রোগের লক্ষণ :

ডিপথেরিয়ার লক্ষণ নির্ভর করবে জীবাণু কোথায় বাসা বেঁধেছে তার উপর। নাকের ভিতর রোগ হলে নাক থেকে সর্দি ঝরতে থাকে, সাথে মাঝে মাঝে রক্ত মেশানো পানি বেরিয়ে আসতে পারে। স্বরযন্ত্রে রোগ হলে কথা বলতে কষ্ট হয়, ফ্যাসফ্যাসে স্বর শোনা যায়, আর কাশি হয় তীক্ষ্ণ। শ্বাস কষ্টও দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত শ্বাস কষ্ট রোগীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে। টনসিলে ডিপথেরিয়া হলে গলা ব্যথা হয় বা গলা ফুলতে পারে। টনসিলেই জীবাণুর বিষক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে না। ধীরে ধীরে তা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুখের ভিতরে তালুকে (palate) অবশ করে দেয়ার ফলে রোগী কোন খাবার এমনকি পানীয় কিছুও গিলতে পারে না। নাক দিয়ে তরল খাবার বেরিয়ে আসে। রোগ শুরু হবার ১০ দিন যেতে না যেতে এসব মারাত্মক উপসর্গ দেখা দেয়। শিরার গতি দ্রুত হয়। রক্তচাপ ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। রক্তচাপ অত্যধিক কমে গেলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। ডিপথেরিয়া হৃদপিণ্ড আর স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত হবার ফলে শিরার গতি প্রথমে দ্রুত, পরে অনিয়মিত হয়। এক সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগী মারাও যেতে পারে। স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণের ফলে বিভিন্ন অংগ অবশ হতে থাকে। শ্বাসক্রিয়ায় সাহায্যকারী বুকের মাংসপেশী এবং অন্যান্য প্রত্যংগ (diaphragm) অবশ হয়ে গেলে শ্বাস বন্ধ হয়ে রোগী মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে।

টনসিল পরীক্ষা :

যেহেতু ডিপথেরিয়া টনসিলেই বেশী হয়, তাই টনসিল দু'টো অত্যন্ত যত্নের সাথে পরীক্ষা করতে হবে। ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত টনসিলের রং হবে কিছুটা কালচে বা ধূসর। টনসিলের ওপর যে পর্দা পড়ে তা সহজে তোলা যায় না, তুলতে গেলেই রক্ত ঝরে।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা :

জীবাণুমুক্ত তুলাকাঠির (sterile swab stick) সাহায্যে গলার লালা (swab), বিশেষত: টনসিলের ওপর থেকে লালা নিয়ে ডিপথেরিয়ার জীবাণু পরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসা :

ডিপথেরিয়া জীবাণুর বিষ নিষ্ক্রিয় করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এন্টিটক্সিন (ADS) প্রয়োগ করা প্রয়োজন। রোগের তীব্রতা অনুসারে এন্টিটক্সিনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। রোগের তীব্রতা সামান্য ও মাঝারি ধরনের হলে মাংসপেশীতে এবং যদি মারাত্মক হয় তখন

(তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের কোন না কোন অঞ্চলে সারা বছর ডায়রিয়া লেগেই থাকে। ডায়রিয়াজনিত রোগে বছরে লক্ষ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়। মৃত্যুবরণ করে কয়েক হাজার। এ পরিসংখ্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)–এর হিসেব মতে বাংলাদেশে ডায়রিয়ায় শিশু–মৃত্যু হার অনেক বেশী। আমাদের আজকের এই লেখাটি পরিসংখ্যান নিয়ে নয়, বরং ডায়রিয়ার প্রজাতি নিয়ে। গত বছর সারা বাংলাদেশেই একটি নতুন ধরনের ডায়রিয়া ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের ডায়রিয়া চিকিৎসা ও গবেষণার একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআরবি'র বিশেষজ্ঞগণ এই নতুন ধরনের ডায়রিয়াকে ভিবরিও কলেরি নন–ও ওয়ান প্রজাতিভুক্ত বলে সনাক্ত করেন। পরে আরও গবেষণা করে ডায়রিয়ার এই নতুন প্রজাতিভুক্ত সদস্যকে ভিবরিও কলেরি ও–১৩৯ 'বেংগল' হিসেবে নামকরণ করা হয়। এই নামকরণ হতে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে, কলেরার পরিবারভুক্ত 'ভিবরিও কলেরি ও ওয়ান'–এর আরও ১৩৮টি সদস্য পূর্বে ছিল এবং বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলে এই নতুন ধরনের জীবাণু সনাক্ত হওয়ায় 'বেংগল' নামকরণ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা ছিল 'ভিবরিও কলেরি নন–ও ওয়ান' অনেকটা নিষ্ক্রিয় এবং মহামারী সৃষ্টি করে না। কিন্তু এই নতুন প্রজাতি 'বেংগল' বিশেষজ্ঞগণের এই ধারণাকে বদলে দিয়েছে। বরং ভিবরিও কলেরি 'বেংগল' অত্যন্ত সক্রিয় এবং মহামারী সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। তবে ভাল দিক হচ্ছে, নতুন ধরনের কলেরার উপযুক্ত চিকিৎসা (অর্থাৎ শুরু থেকেই স্যালাইন খাওয়ানো, প্রয়োজনে অন্তশিরা স্যালাইন ও জীবাণুনাশকের ব্যবহার) হলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। ঢাকার মহাখালীস্থ কলেরা হাসপাতালে এই নতুন ধরনের ডায়রিয়া চিকিৎসায় অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে এবং কোন রোগীর মৃত্যু ঘটেনি।

পক্ষান্তরে, গত বছর দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশের প্রায় সব জেলাসমূহে এই নতুন ধরনের ডায়রিয়ার ব্যাপক প্রকোপ দেখা যায়। মৃত্যু ঘটে কয়েক হাজার লোকের। আশা করা যায়, স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত স্যালাইন সরবরাহ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে এ বছর ডায়রিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচীকে তরান্বিত করার মাধ্যমে একটি যথাযথ চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আগামীতে দেশের সবগুলো এলাকায়ই ডায়রিয়ায় মৃত্যুহার একেবারে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে সকলের সহযোগিতা একান্তই কাম্য।

* স্বাস্থ্য সংলাপের গত সংখ্যায় (বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, কার্তিক) ডায়রিয়ায় জীবাণুনাশকের ব্যবহার দেখুন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে ইনজেকশন

মোঃ হুমায়ুন কবির ও ডাঃ ফজলুর রহমান

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ইতিহাস দীর্ঘ চল্লিশ বছরের হলেও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে ইনজেকশনের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে ডিএমপিএ এবং নেট–এন এই দু'রকমের ইনজেকশন অন্তর্ভুক্ত করা হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮০ সালে। অস্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে ইনজেকশনের জনপ্রিয়তা বাংলাদেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইনজেকশন পদ্ধতির মোট ব্যবহারকারী সংখ্যা হ'ল–৮৬০৮৯২, যা সর্বমোট পদ্ধতি ব্যবহারকারীর পাঁচ ভাগ। (জুন ১৯৯৩, সূত্রঃ এমআইএস ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর)। ডিএমপিএ এবং নেট–এন গর্ভনিরোধক হিসেবে যথাক্রমে ৮০ ও ৩০টির বেশী দেশে অনুমোদিত। অক্টোবর ১৯৯২ সালে আমেরিকায় ডিএমপিএ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে অনুমোদন লাভের পর এ পদ্ধতি ব্যবহারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন কি?

ইনজেকশন মহিলাদের জন্য অস্থায়ী ও স্বল্প মেয়াদী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ইনজেকশনে প্রজেষ্টারেন নামক একটি বিশেষ হরমোন রয়েছে যা সহজে এবং সফলভাবে গর্ভধারণ প্রতিরোধ করে। বাংলাদেশে দু'ধরনের জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইনজেকশনের প্রচলন আছে, যথাঃ ডিপো–প্রভেরা বা ডিএমপিএ এবং নরিষ্টারেট বা নেট–এন। ডিপো–প্রভেরা তিন মাস পর পর এবং নরিষ্টারেট দু'মাস পর পর নিতে হয়। নির্ধারিত তারিখের ৭ দিন আগে বা পরেও নেয়া যায়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন নেয়া শুরু করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত, কেননা আপনার শারীরিক অবস্থা ইনজেকশন নেয়ার উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ইনজেকশনের সুবিধা

- অত্যন্ত কার্যকরী (৯৯ শতাংশেরও বেশী)
- সহজে পাওয়া যায়।
- ২/৩ মাসের জন্য গর্ভ প্রতিরোধ করে। প্রতিদিন ব্যবহারের ঝামেলা নেই।
- স্তন্যদানে কোন অসুবিধা নেই।
- গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়।
- রক্তজমাট বাঁধা বা হার্টের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়ার আশংকা নেই।
- রক্ত স্বল্পতা কমাতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।
- সহবাসের সংগে ইনজেকশন ব্যবহারের কোন সম্পর্ক নেই।

ইনজেকশনের অসুবিধা

- কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে যেমন–মাসিক বন্ধ, ফোঁটা ফোঁটা স্রাব কিংবা বেশী রক্তক্ষরণ হতে পারে। মাথা ব্যাথা, কিঞ্চিৎ ওজনও বাড়তে পারে, স্তন ভারী বোধ হতে পারে।

- গর্ভধারণ ক্ষমতা ফিরে আসতে দেরী হয়।
- নিজে নেয়া যায় না, প্রসিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী দ্বারা সময়সূচী অনুযায়ী নিতে হয়।

ইনজেকশন কারা নিতে পারেন

- যাঁদের কমপক্ষে একটি সন্তান আছে, আপাততঃ সন্তান নিতে চান না।
- সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো অবস্থায়।
- যাঁরা আপাততঃ স্থায়ী পদ্ধতি নিতে আগ্রহী নন, যাঁদের দু'টি বা তার চেয়ে বেশী সন্তান রয়েছে।
- যাঁরা নিয়মিত বড়ি খেতে প্রায়ই ভুলে যান অথবা প্রতিদিন বড়ি খাওয়া ঝামেলা মনে করেন।
- বড়ি খেলে যাঁদের অসুবিধা হয় অথবা শারীরিক কারণে নিষেধ আছে।

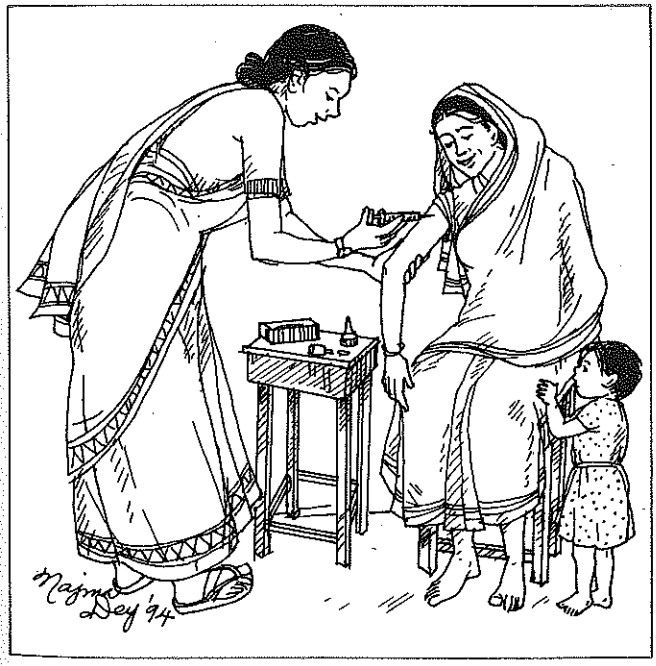

ইনজেকশন কারা নিতে পারেন না

- নিঃসন্তান হলে।
- গর্ভাবস্থায় বা গর্ভবতী বলে সন্দেহ হলে।
- স্তনে চাকা বা ক্যান্সার থাকলে।
- জরায়ু, জরায়ুর মুখ বা ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার থাকলে বা সন্দেহ হলে।
- দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে বা সহবাসের পর অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হলে।
- লিভারের গুরুতর অসুখ বা এক বছরের মধ্যে জণ্ডিসের ইতিহাস থাকলে।
- হৃদরোগ থাকলে।

ইনজেকশন কখন নিতে হয়

- মাসিক শুরু হবার ৫ দিনের মধ্যে।
- গর্ভপাত বা এম.আর করার পরপরই।
- বাচ্চা হবার ৬ সপ্তাহ থেকে ৬ মাসের মধ্যে।
- খাবার বড়ি বন্ধ করার পর মাসিক শুরু হবার ৫ দিনের মধ্যে।

ইনজেকশন কোথা থেকে এবং কিভাবে পেতে পারেন

সরকারী কার্যক্রমে ইনজেকশন সরবরাহ করা হয় ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (FWC) থেকে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার (FWV) মাধ্যমে। থানা, জেলা পর্যায়ে মাতৃমংগল শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এমসিএইচ ইউনিট এবং জেলা হাসপাতাল থেকেও ইনজেকশন পাওয়া যাচ্ছে।

সরকারী কার্যক্রমের পাশাপাশি কিছু বেসরকারী সংস্থাও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যেমন–ক্রিশ্চিয়ান হেলথ কেয়ার প্রকল্প, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, পরিবার পরিকল্পনায় আত্মনিবেদিত মহিলা প্রকল্প, এশিয়া ফাউণ্ডেশন, আইসিডিডিআর,বি–র মতলব প্রকল্প ইত্যাদি।

ইনজেকশনের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে জনগণের চাহিদাকে সামনে রেখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ইনজেকশন পদ্ধতি ক্লায়েন্টদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর আর্থিক সহায়তার যোগান দিচ্ছে UNFPA এবং কারিগরী সহায়তা দিচ্ছে আইসিডিডিআর,বি–র এমসিএইচ–এফপি সম্প্রসারণ প্রকল্প। প্রাথমিক পর্যায়ে আটটি থানায় এ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে (১৯৯৩ সালে)। কর্মসূচীর মূল্যায়নের উপরই নির্ভর করবে পরবর্তী সম্প্রসারণ। ■

ডিপথেরিয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অন্তঃশিরায় ইনজেকশন দিয়ে ওষুধটি দিতে হবে। রোগীকে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে দ্রুত স্থানান্তর করলে ভাল হয়।

জীবাণুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন নামক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। এক সপ্তাহ ধরে এই ওষুধ দিতে হবে। পেনিসিলিনের বিকল্প হিসেবে এরিথ্রোমাইসিন দেয়া যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

ডিপথেরিয়া রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক অভিভাবককে বাংলাদেশ সরকারের সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচীর সুযোগ নিতে হবে। জন্মের পর দেড় মাস বয়স থেকে শুরু করে ১ মাস অন্তর অন্তর তিন মাসে তিনটি ইনজেকশন প্রয়োগ করে সহজে এই জীবননাশী রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলো দেখা গেলে দেরী না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে লালা পরীক্ষা করিয়ে শুরুতেই রোগ সনাক্ত করে উপযুক্ত চিকিৎসা করালে মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক কমে যায়। ■

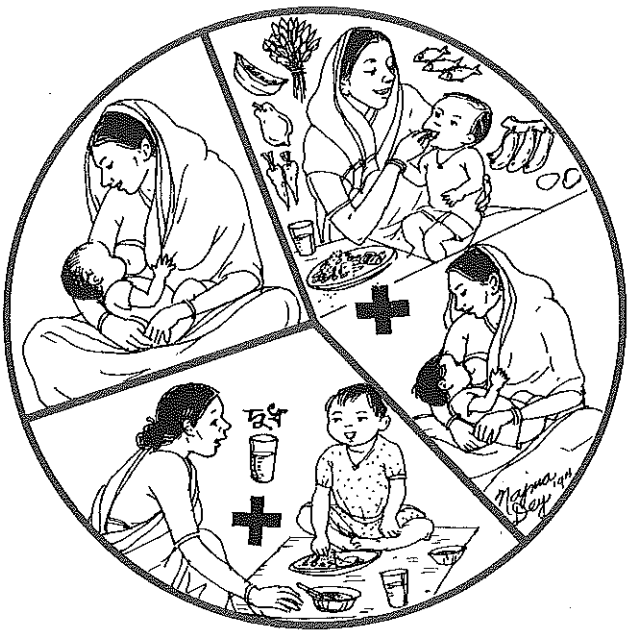

শিশুকে কোন বয়সে কি খাওয়াবেন

নাসিহা মজিদ

একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শক্তি ও পুষ্টির চাহিদা। কিভাবে শিশুর এই চাহিদাসমূহ পূরণ করা যায় সেটাই বিবেচ্য বিষয়। গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ প্রদত্ত শিশুখাদ্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। তাই শিশু জন্মাবার পরপরই তাকে মায়ের দুধ খেতে দিন। বুকের দুধের ঘন হলুদ শাল দুধই হবে তার প্রথম খাদ্য। এই শাল দুধই শিশুর চারপাশের অসংখ্য রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাই মধু নয়, পানি নয়, চিনির পানি বা মিছরির পানি নয়, তেল নয় — অন্য কোন কিছুই নয়, মায়ের দুধই হবে শিশুর প্রথম খাদ্য, যেমনটি হয় অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে ৩৬০৬ রকমের। এরা সকলেই নিজেদের শিশুদের নিয়ম মাফিক স্তন্যদান করে। ব্যতিক্রম ঘটছে কেবল স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মানুষের বেলায়। তাই প্রতিটি গর্ভবতী মাকেই শিশু জন্মাবার পর তার মুখে বুকের দুধ তুলে দেয়ার জন্য সর্বতোভাবে তৈরী থাকতে হবে। পাঁচমাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে কেবলমাত্র মায়ের বুকের দুধ খেতে দিন। এ সময় অন্য কিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন হয় না। এমন কি পানিও নয়, কেননা, বুকের দুধ সকল চাহিদা পূরণ করে।

মায়ের বুকের দুধ শিশু কখন কিভাবে কতটুকু খাবে

নবজাত শিশু জন্মের পরপরই ক্ষুধা অনুভব করে এবং কচি ঠোঁট নেড়ে খাবার খুঁজতে থাকে। এ সময়ে মায়ের বুকের দুধের বোঁটা পরিষ্কার করে শিশুর মুখে দিতে হবে। শিশু তার প্রয়োজনীয় দুধটুকু চুকচুক করে খেয়ে নিবে। তাকে কারও শিখিয়ে দিতে হয় না কিভাবে দুধ খেতে হয়। তার ঠোঁটে দুধের বোঁটা পৌঁছুলে প্রাকৃতিক নিয়মেই সে চুষতে থাকে। মাকে এসময় আরাম করে বসে নিতে হবে এবং শিশুর মাথা উঁচু করে সহজভাবে ধরতে হবে। প্রথম ২–৩ সপ্তাহ শিশুর ঘুম বেশী থাকে। তাই একটু খেয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ে। এ সময় তাকে মাঝে মাঝে জাগিয়ে দুধ খেতে দিন। এরপর তার খাওয়ার চাহিদা বেড়ে যায়, সে ঘন ঘন খেতে চায়। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য কোন বাধা ধরা সময় অনুসরণ করা প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ মা যখন খুশী শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারেন, শিশু যখন ইচ্ছা খেতে চাইতে পারে। দিনে ২০–২৫ বারও দুধ খাওয়ানো যেতে পারে। মনে রাখবেন, শিশুকে যত বেশী বুকের দুধ খাওয়ানো যাবে বা শিশু যত বেশী বার বুকের দুধ টানবে মায়ের বুকের দুধ তত বেশী পরিমাণ পাওয়া যাবে।

একজন মা দৈনিক কতটুকু বুকের দুধ সরবরাহ করতে পারেন এবং শিশুর বয়স অনুপাতে কতটুকু দুধ প্রয়োজন তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :—

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	দৈনিক দুধ সরবরাহের পরিমাণ (মিঃলিঃ)	শক্তি (কিলোক্যালরি)		আমিষ (গ্রাম)	
			দুধ থেকে সরবরাহ	দৈনিক প্রয়োজন	দুধ থেকে সরবরাহ	দৈনিক প্রয়োজন
০–১	৩.৮	৭১৯	৫০৩	৪৭০	৯.৩৫	৮.৯৩
১–২	৪.৭৫	৭৯৫	৫৫৬	৫৫০	৯.১৫	১০.৭
২–৩	৫.৬	৮৪৮	৫৯৪	৬১০	৯.৭৫	১০.১
৩–৪	৬.৩৫	৮২২	৫৭৫	৬৫৫	৯.৪৫	৯.৩৩
৪–৫	৬.৯	৮৫০	৫৯১	৬৮০	৯.৬	৮.৫

এখানে উল্লেখ্য যে শিশুর ৩–৬ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ প্রত্যহ গড়ে ৮৫০ মিঃলিঃ থাকে। ৬–১২ মাস বয়স পর্যন্ত তা কমে প্রত্যহ ৬০০ মিঃলিঃ হয়। আবার ১২–১৪ মাস বয়স পর্যন্ত সময়ে দুধ আরো কমে দৈনিক ৫৫০ মিঃলিঃ হয়। এতে দেখা যাচ্ছে যে শিশু ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত প্রত্যহ আধা লিটারেরও বেশী দুধ খেতে পারে।

পাঁচ মাস পূর্ণ হলে শিশুকে বাড়তি খাবার খেতে দিন

শিশুর বয়স ৫ মাস পূর্ণ হলে শুধুমাত্র বুকের দুধে তার শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় না। তাই পাশপাশি তাকে অন্যান্য তোলা বা বাড়তি খাবার খাওয়ানো শুরু করুন।

কি খাবার দিবেন?

প্রথম যেদিন আপনার শিশুকে বাড়তি খাবার দিবেন, পরিবারের জন্য রান্না করা দু'লোকমা পরিমাণ গরম ভাত চটকে নরম করে তাতে সামান্য একটু মাছ, চা চামচের এক চামচ সয়াবিন তেল, রান্না করা ডালের ঘন কিছুটা ডাল নিয়ে মেখে খেতে দিন। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গ্লাসে করে একটু একটু পানি খেতে দিন। এ খাবার সে কতটুকু খাবে? আপনার লোকমার এক বা দেড় লোকমা মাত্র। এতেই তার প্রথম খাওয়ার পর্ব শেষ। এর পরই তাকে বুকের দুধ খেতে দিন। কেননা শুধু এ খাবার খেয়ে তার তৃপ্তি হবে না। এভাবে সে পাঁচমাস থেকে এক বছর বয়স পর্যন্ত দিনে ২–৩ বার বাড়তি খাবার খাবে। টাটকা রান্না করা খাবার, যেমন : (১) নরম ভাতের সাথে ডাল, মাছ ও তেল, (২) নরম ভাত, ডাল ও শাক, (৩) আটার রুটি ডাল দিয়ে চটকে, (৪) পাকা কলা, (৫) সুজির হালুয়া, (৬) দুধ-কলা ভাত, (৭) ভাত বা রুটির সাথে ভাজা বা সিদ্ধ ডিম চটকে ইত্যাদি তাকে খেতে দিন। সেই সাথে মৌসুমী ফল, যেমন :

আম, পেঁপে ইত্যাদিও খাবে। আপনার পক্ষে সম্ভব হলে শিশুর জন্য এক মুঠ চাল, আধা মুঠ ডাল, সামান্য শাক ও আধা ছটাক তেল দিয়ে রান্না করা নরম খিচুড়ী শিশুকে খেতে দিন। সর্বোপরি ঘরের সব ধরনের খাবার, যখন যা সম্ভব তখন তা তাকে খেতে দিন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন খাবার বাসী বা পচা না হয়। অনেক মাকে শিশুর খাবার তৈরী নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। মনে রাখবেন, তার জন্য কোন দামী বা বিশেষ খাবারের প্রয়োজন নেই। শিশুর বাড়তি খাবারের সাথে সাথে বুকের দুধও খাওয়াতে হবে। খাবার দেয়ার শুরুতে হয়তো শিশু অল্প পরিমাণ খেতে পারে তাকে জোর করে খাওয়ানোর দরকার নেই। লক্ষ্য রাখবেন, বাড়তি খাবার পর্বটি হবে শিশুর জন্য আনন্দের, ভীতির নয়। সে একবার খেতে না চাইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার চেষ্টা করুন। শিশুকে খাওয়ানোর ব্যাপারে মাকে অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলা হতে হবে। মাকে বুঝে নিতে হবে, শিশু টক, ঝাল, মিষ্টি কোনটি বেশী পছন্দ করে। কোন কোন শিশু মিষ্টি মোটেই পছন্দ করে না। আবার কেউবা ঝাল পছন্দ করে না।

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য সম্ভব হলে প্রতিমাসে শিশুর ওজন নিন।

এক থেকে দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাবার

শিশুর এক বছর বয়স পূর্ণ হলে সে রীতিমত আপনার সাথে বড়দের মত সকালের নাস্তা ও বিকেল চারটায় বাড়তি নাস্তা খাবে। এক বছর বয়সের পর শিশুর পুষ্টি চাহিদার এক তৃতীয়াংশ বুকের দুধ থেকে পূরণ হয়। বাকী পুষ্টি বাড়তি খাবার থেকে সরবরাহ করতে হয়। মনে রাখবেন, শিশুর পেট ছোট বলে পুষ্টি চাহিদা মেটাতে তাকে বার বার খেতে হবে। তাই বড়দের তুলনায় তাকে দিনে ২-৩ বার বেশী খাবার দিতে হবে। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার খাবারের পরিমাণও বাড়বে। কারণ, শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধির প্রয়োজনেই অতিরিক্ত খাবার দরকার।

নমুনাস্বরূপ এক বছর বয়সের শিশুর একটি খাদ্য তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

খাদ্য	পরিমাণ	আমিষ (গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কি. ক্যালরি)
মায়ের দুধ (দৈনিক ১০-১২ বার খাবে)	৫৫০ মিঃলিঃ	৫.৫	৩৮০
রুটি/পাউরুটি	১টা	১	৭০
ভাজা ডিম	অর্ধেক	৩.৫	৫০
ভাত	১ কাপ	১	১২০
মাছ/মাংস	২ টুকরা	৪	৮০
রান্না করা সবজী	আঁধা কাপ	০.৫	৩০
ডাল (ঘন)	আঁধা কাপ	১	৬০
খিচুড়ী/সুজির হালুয়া	আঁধা কাপ	১.৫	১০০
মুড়ির মোয়া/পিঠা	২টা	১.৫	১০০
মৌসুমী ফল		০.৫	৩০
		২০ গ্রাম	১০২০ কি. ক্যালরি

১ বৎসরের শিশুর জন্য আদর্শ খাদ্য তালিকা

দেহের ওজন-১০ কেজি
প্রয়োজনীয় খাদ্যশক্তি-১০০০ কি. ক্যালরি
আমিষ-২০ গ্রাম

কখন কি খাবে

সকালের নাস্তা

পাউরুটি বা আটার রুটি	১টা
ডিম ভাজা	অর্ধেক অথবা
ডালের চচ্চরি	চায়ের কাপের ১/৪ পরিমাণ

সকাল ১০টা

খিচুরী বা সুজির হালুয়া	আঁধা কাপ
মৌসুমী ফল	

দুপুরের খাবার

ভাত	আঁধা কাপ
মাছ/মাংস	১ টুকরো
রান্না সবজী	অল্প
ডাল	অল্প

বিকেল ৪টা

মুড়ির মোয়া/পিঠা	২টা
মৌসুমী ফল	

রাতের খাবার

দুপুরের মত

এখানে উল্লেখ্য যে এক বছর থেকে দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্য তালিকা একই থাকবে, তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার খাবারের পরিমাণ বাড়বে।

শিশুর খাদ্যে দুধের একমাত্র উৎস হবে বুকের দুধ। শিশু দু'বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন বুকের দুধ খাবে ততদিন তার জন্য বাইরের কোন দুধের প্রয়োজন নেই। দু'তিন বছর বয়সে শিশুকে আপনার মত সকল খাবারে অভ্যস্ত করুন। সে পরিবারের সকলের সাথে সব ধরনের খাবার খাবে। ■

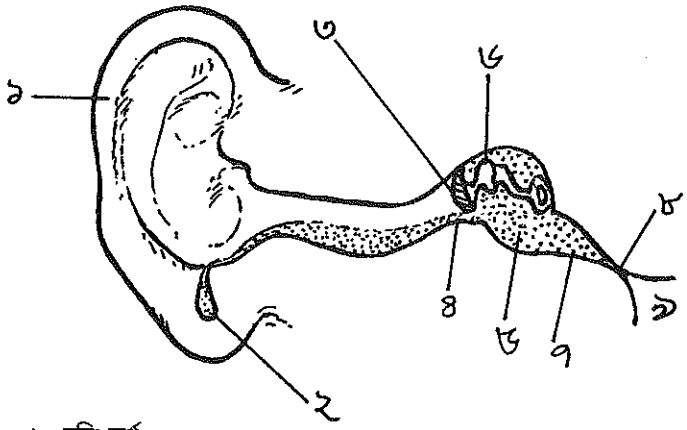

১. বহিঃ কর্ণ
২. কানের ছিদ্র পথে পুঁজ বেরিয়ে আসছে
৩. কানের পর্দা
৪. কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট ছিদ্র
৫. পুঁজ ভর্তি মধ্যকর্ণ
৬. ছোট অস্থি
৭. ইউস্টাসিয়ান টিউব
৮. ইউস্টাসিয়ান টিউবের বন্ধ হয়ে যাওয়া অংশ
৯. ফ্যারিংস

কানপাকা রোগ

ডাঃ সৈয়দ সামিউল হক ও
ডাঃ তাসকিন দিলশাদ

কানপাকা রোগ বলতে সাধারণভাবে মধ্যকর্ণের সংক্রমণ বুঝায়। কানের পর্দার আড়ালে ছোট কুঠুরীর মত অংশটি মধ্যকর্ণ। ইউষ্টাসিয়ান টিউব (চিত্রে দেখুন) নামের একটি নালী এই মধ্যকর্ণ এবং গলা বা ফ্যারিংস (শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের একটি অংশ) এই দুই-এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। কোন কারণে এ ইউষ্টাসিয়ান টিউব বন্ধ হয়ে গেলে মধ্যকর্ণের স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যহত হয়। যার ফলে নানারকম রোগ-জীবাণু বিস্তার লাভ করে এবং মধ্যকর্ণের সংক্রমণ ঘটায়। প্রায়শঃ শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের ভাইরাসজনিত সংক্রমণেই এরূপ হয়ে থাকে যাকে আমরা বাচ্চাদের ঠাণ্ডা লাগা বা সর্দি হওয়া বলে থাকি।

কানপাকা রোগ দু'ধরনের হতে পারে

ক। তীব্র (acute)-যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা এ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসায় ভাল হয়ে যায়।

খ। মেয়াদী (chronic)-সময়মত চিকিৎসা না পেলে অথবা দু'সপ্তাহের মধ্যে ভাল না হলে কানপাকা রোগ দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করে এবং এর থেকে মারাত্মক ও জটিল ধরনের অস্থি সংক্রমণ এমনকি মস্তিষ্কের সংক্রমণ পর্যন্ত হতে পারে।

শিশু এবং কিশোররাই কানপাকা রোগে বেশী ভোগে। সাধারণতঃ ৬ মাস বয়সের পরে বাচ্চাদের মধ্যে এই কানপাকা রোগ দেখা যায়। বাচ্চাদের ইউষ্টাসিয়ান টিউব সোজা, চওড়া এবং লম্বায় ছোট হওয়ায় এরা সহজেই আক্রান্ত হয়। যেসব শিশুরা বোতলে দুধ খায় তাদের মধ্যে এ রোগ বেশী দেখা যায়। পুষ্টিহীন শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় এরা কানপাকা রোগে বেশী আক্রান্ত হয়।

কি কি কারণে এ রোগ হতে পারে

ক। শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের পুনঃ পুনঃ সংক্রমণ

খ। সাধারণ সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা

গ। মুখগহবরের গ্রন্থি (adenoid) বড় হয়ে গেলে

ঘ। টনসিলের সংক্রমণ

ঙ। নাক ও গলার সংযোগস্থলে (nasopharynx) টিউমার বা অন্য কোন কারণে ইউষ্টাসিয়ান টিউব বন্ধ হয়ে গেলে।

চ। হাম

ছ। মুখ ও খুলির হাড়ের মাঝে অবস্থিত কিছু ফাঁপা অংশের প্রদাহ (sinusitis) হলে।

উপসর্গ বা লক্ষণ

প্রধান উপসর্গ কান ব্যাথা। এছাড়া শিশুদের ক্ষেত্রে খাবারে অনীহা দেখা দেয়, কানে কম শুনতে পারে, চিৎকার করে কাঁদে ও যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করে। জ্বর থাকতে পারে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি শিশুর বমি অথবা পাতলা পায়খানা হতে পারে। এক পর্যায়ে কানের পর্দা ফেটে যায় এবং পুঁজ বেরিয়ে আসে। এ সময় জ্বর, কানব্যথা এসব কমে যায়। সময়মত চিকিৎসা করলে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার আগেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে, আর পর্দা ফেটে গেলেও পুঁজ পড়া বন্ধ হয় এবং শ্রবণ শক্তি ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে আসে।

পক্ষান্তরে উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে সব সময় কান হতে পুঁজ পড়া ও শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়া ছাড়াও অন্যান্য জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন রোগীর সবসময় জ্বর থাকে, কানের পেছনে ব্যথা হয় ও ফুলে গিয়ে মারাত্মক অস্থি সংক্রমণ এমনকি মস্তিষ্কের সংক্রমণও হতে পারে।

কানপাকা রোগের চিকিৎসা যেভাবে করা যেতে পারে

উপসর্গ বা লক্ষণ	চিকিৎসা
* শুধু কান ব্যাথা	* ১। সংক্রমণরোধে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ২। ব্যাথার জন্য প্যারাসিটামল ব্যবহার
* কান হতে পুঁজ পড়া (২ সপ্তাহের কম)	* ১। এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ২। কান শুষ্ক রাখা (শুকনা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার এবং শুকনা রাখতে হবে)
* কান হতে পুঁজ পড়া (২ সপ্তাহের বেশী)	* কান পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা
* কানের পেছনে ফোলা ও কানে ব্যাথা	* ১। এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ২। রোগীকে জরুরীভিত্তিতে হাসপাতালে স্থানান্তর করা দরকার।

প্রতিরোধ

কিভাবে কান শুষ্ক রাখা যেতে পারে

* এক টুকরা শুষ্ক পরিষ্কার ও নরম কাপড় সল্‌তের মত পেঁচিয়ে নিয়ে কানের ভেতর অল্প একটু ঢোকান।

* না ভেজা পর্যন্ত কাপড়ের টুকরাটি কানের ভেতরে রাখুন।
* এবারে ভেজা টুকরাটি সরিয়ে একইভাবে আরেক টুকরা কাপড় কানের ভেতর রাখুন এবং যতক্ষণ না কান শুষ্ক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কয়েকবার এরকম করুন।

দিনে ৩ বার এই নিয়মে কান পরিষ্কার করতে হবে যাতে কান শুষ্ক থাকে। এভাবে ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে কান থেকে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়।

কান পাকা রোগে যা করা উচিত নয়

* কাঠি, পাখির পালক অথবা ক্লিপ দিয়ে কান খোঁচানো।
* ডুব দিয়ে গোসল করা, মাথায় পানি ঢালা বা শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করা।
* কানের ভিতরে তেল বা পানি দেয়া।
* ময়লা কাপড় অথবা অপরিষ্কার তুলা দিয়ে কান পরিষ্কার করা।

আপাতঃদৃষ্টিতে কানপাকা রোগ সামান্য মনে হলেও একে অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ, এর থেকে পরবর্তীতে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ রোগ শিশুর মানসিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে বা পড়াশোনায় অমনোযোগী করে তোলে।

কানপাকা রোগের প্রকোপ কমাতে হলে—

* শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
* পুষ্টিহীনতা দূর করতে হবে।
* সময়মত শিশুর সর্দি-কাশির চিকিৎসা করাতে হবে।
* টনসিলের প্রদাহ, মুখগহবরের গ্রন্থির প্রদাহ কিংবা গলা ও নাকের সংযোগস্থলে কোন ফোড়া থাকলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে হবে।

কাজেই আমরা দেখছি যে প্রত্যহ শিশুর পরিচর্যা ও খাওয়া-দাওয়া সাবধানতার সাথে করলে এবং সর্দি-কাশির শুরুতে উপযুক্ত চিকিৎসা করলে কানপাকা বা প্রদাহের মত রোগ এড়ানো সম্ভব। আর একান্ত যদি কানপাকা রোগ হয়েই যায় তবে দেরী না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করলে শিশুর শ্রবণ শক্তি রক্ষা করা যায় এবং অন্য যে কোন রকমের জটিলতাও এড়ানো যায়। ■

স্বাস্থ্য কুইজ-৬-এর উত্তর

১. যে সকল মায়েরা বাচ্চাদের বুকের দুধ দেন তাঁদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন :
   - মহিলা বন্ধ্যাকরণ
   - পুরুষ বন্ধ্যাকরণ
   - আই ইউ ডি
   - কনডম
   - শুধু প্রোজেষ্টিন গঠিত পদ্ধতিঃ ইনজেকটেবল ও ইমপ্ল্যান্ট

২ প্রসবোত্তর পরীক্ষার সময় মাকে নুন্যতমপক্ষে যে সকল বিষয় প্রশ্ন করা উচিত তা হলো ঃ
   - মায়ের জ্বর
   - দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব
   - রক্তস্রাবের পরিমাণ
   - তলপেটে অসহ্য ব্যাথা
   - নবজাত শিশুর জ্বর
   - নবজাত শিশুর নাভি

৩. পুনঃ ব্যবহারযোগ্য সূচ এবং সিরিঞ্জ ভালভাবে নির্বীজন (sterilize) না করা হলে হেপাটাইটিস ও এইডস-এর মত মারাত্মক রোগ হতে পারে।

৪. একটি ১০ মাসের বাচ্চা স্বাভাবিকভাবে মিনিটে ৫০ বারের কম শ্বাস প্রশ্বাস নিবে।

৫. গর্ভবতী হওয়ার আগে যদি ২ ডোজ টি টি টিকা না নিয়ে থাকেন তাহলে গর্ভকালীন সময় ২ ডোজ টিকা ১ মাসের ব্যবধানে ৫ থেকে ৮ মাসের মধ্যে নিতে হবে। শেষ টিকা অবশ্যই প্রসবের ৪ সপ্তাহ আগে নিতে হবে। যদি গর্ভবতী হওয়ার আগে ২ ডোজ টিকা নিয়ে থাকেন তাহলে গর্ভকালীন সময় ১ ডোজ টিকা নিতে হবে।

(উল্লেখ্য যে আমরা কারো কাছ থেকে সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইনি)

স্বাস্থ্য কুইজ-৭

১. নবজাতকের ধনুস্টংকার কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

২. ভিটামিন 'এ' যুক্ত পাঁচটি খাবারের নাম বলুন।

৩. বাড়ীতে জ্বরের প্রাথমিক চিকিৎসা কি হওয়া উচিত?

৪. গর্ভবতী মায়েদের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত এবং গর্ভকালীন সময় রক্তচাপ কত হলে তাকে অস্বাভাবিক বলা হয়?

৫. প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ২ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের কি পরিমাণ খাবার স্যালাইন দিতে হবে?

(উত্তর আমাদের কাছে ৭ মার্চ ১৯৯৪ তারিখের আগেই পৌছাতে হবে।

জেনে রাখা ভাল

রক্তক্ষরণ হলে কি করবেন?

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত কোন না কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এসব দুর্ঘটনায় কাটাছেঁড়া, জখম, অংগহানি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে জখম বা ক্ষতস্থান হতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। যদি এসব ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায় তবে মৃত্যুহার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া অনেক সময় বমি বা কাশির সাথেও নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। ধরা যাক, বাসার কনিষ্ঠতম সদস্য শিশুটি যে কোন কারণে পড়ে গিয়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে হাত বা পা কেটে গেল আপনি নিশ্চয়ই রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য হাসপাতালে নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। অর্থাৎ পারিবারিক ও স্থানীয়ভাবে রক্তক্ষরণজনিত সমস্যার ব্যবস্থা আপনি নিজেই নিতে পারেন, তা নিয়েই আমাদের আজকের লেখা।

ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হলে কি করবেন?

* প্রথমে ক্ষতস্থানেই হাত দিয়ে চেপে ধরতে হবে যাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ না হতে পারে। সম্ভব হলে ক্ষতস্থানের চামড়ার প্রান্তগুলোও মিলিয়ে চেপে ধরতে হবে।

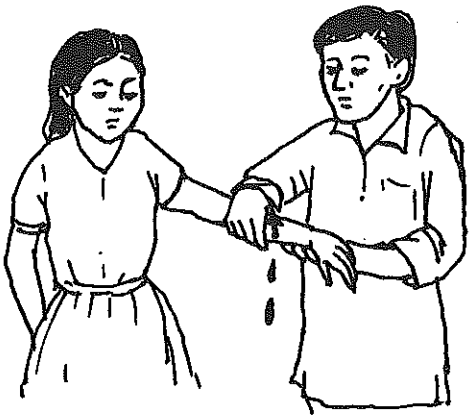

* হাত বা পায়ের কাটা বা ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করার প্রয়োজন হলে রোগীকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতে হবে। হাত বা পায়ের ক্ষতস্থানটির যথাযথ ব্যাণ্ডেজ ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হলে হাত বা পা উপরের দিকে তুলতে হবে, যাতে রক্তের চাপ কমে যায়। এরপর অন্য কোন কাপড় হাতের কাছে পাওয়া না গেলে পকেটের রুমাল বা পরিধানের কাপড়ের একটি অংশ ছিড়ে এক হাত দিয়ে ক্ষতস্থান মোটামুটি শক্তভাবে চেপে ধরতে হবে, যাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়।

* ক্ষতস্থানে রক্ত বন্ধ করার জন্য এরপর চেপে ধরা কাপড়ের দু'দিকে মাথার স্কার্ফ, গলার টাই, বেল্ট অথবা অন্য কোন কাপড় দিয়ে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজের মত বেঁধে রাখতে হবে। গিট যাতে খুলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে কোন অবস্থায় দড়ি বা অন্য কোন মোটা সুতা ব্যবহার করা যাবে না।

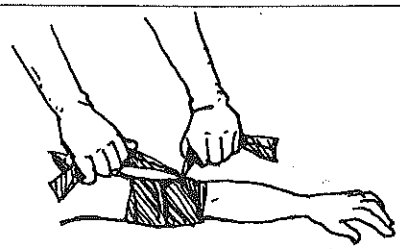

* যদি ক্ষতস্থান বড় হয় এবং রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থেকেই যায় তবে তাড়াতাড়ি নিকটস্থ হাসপাতালে বা ক্লিনিকে নেয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
* ক্ষতস্থান সামান্য হলে হাসপাতালে না নিলেও চলে। তবে ঘরে বা স্থানীয়ভাবে এন্টিসেপটিক লোশন বা জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে ক্ষতস্থানটি ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে। (অধিকাংশ বাড়িতে স্যাভলন, ডেটল, সেপনিল ইত্যাদি থাকে।) এরপর পরিষ্কার শুকনা কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। তবে বাড়িতে যদি পরিষ্কার গজ বা ব্যাণ্ডেজ থাকে তাই ব্যবহার করতে হবে।
* যদি ক্ষতস্থানে একাধিক জখম থাকে এবং জখমের প্রকৃতি এমন হয় যে ব্যাণ্ডেজ করা সহজ নয়, সেসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেপে ধরে বা ক্ষতস্থান বেঁধে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। মনে রাখবেন, এ ধরনের দুর্ঘটনায় টিটেনাস টকসয়েড ইনজেকশন নিতে হবে। এ ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কাশি ও বমির সাথে রক্ত গেলে কি করবেন?

* কাশি ও বমির সাথে রক্ত গেলে রোগীকে বিছানায় একটু কাত করে শুইয়ে দিতে হবে। এরপর কাপড় দিয়ে মুখের রক্ত ও বমি মুছে ফেলতে হবে। অতঃপর চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে অথবা নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে। সামান্য নমুনা চিকিৎসককে দেখাতে হবে। অনুরূপভাবে মলের সাথে রক্ত নির্গত হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ বাঞ্ছনীয়।

অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ

* যদি দুর্ঘটনাজনিত অথবা অন্য কোন কারণে শরীরের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ হয় তবে রোগীর ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ তেমন নাও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে রোগীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, রোগীর অতিরিক্ত ঘাম, পিপাসা, নাড়ীর স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হওয়া, রোগী অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ নিতে হবে।
  - এ অবস্থায় মাথা নিচের দিকে দিয়ে পা সামান্য উপরের দিকে তুলে শুইয়ে দিতে হবে।
  - পরিধানের কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে।
  - রোগীকে গরম কাপড় অথবা কম্বল জড়িয়ে দিতে হবে।
  - মুখে কোন খাবার খাওয়াবেন না।
  - দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

(সংগ্রহ : ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ এম. নজরল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, ডাঃ এ.এস.এম. মিজানুর রহমান, মুজিবুর রহমান ও ডাঃ তানজিনা মির্জা; **সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ** হাসান শরীফ আহমেদ; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী। **প্রকাশক ঃ** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর.,বি.), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০।

ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮, ৬০০২৭১-২; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬, ৮৮০-২-৮৮৬০৫০; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আই.সি.ডি.ডি. বি.জে.।

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ